এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কাউন্সেলিং-এ মডেল বিভ্রান্তি

[পর্ব ৪]

(চলমান সিরিজ : বাংলাদেশে কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপী নিয়ে বিভ্রান্তি)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডঃ মাহমুদুর রহমান
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[বিভ্রান্তির আলোচনায় যাবার আগের কথা ঃ

৪র্থ পর্বে লিখছি কাউন্সেলিং এর মডেল বিভ্রান্তি নিয়ে। গত সংখ্যা দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এ ২০০৪ এর অক্টোবরে মডেল বিভ্রান্তির কিছু আভাষ দিতে গিয়ে শিকওয়ার ন্যায় কিছু প্রশ্নের অবতারণা করেছিলাম এবং সেদিন সময়ের অভাবে পাঠকদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে এ সকল প্রশ্নের 'জবাবে শিকওয়াহ' আমি পরবর্তী সংখ্যায় দিব। ২০০৫ এর অক্টোবরেই দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট এর বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে জানি–তাই এক বছরের অব্যক্ত কথাগুলো লিখবো বলে কলম ধরেছি। এদিকে সময় বয়ে গেছে অনেক, গড়িয়ে গেছে অনেক গঙ্গার জল, অন্যান্য নদীর অনেক পানি, আমাদের সবার জীবনে ঘটেছে অনেক পরিবর্তন, জমেছে অনেক অভিজ্ঞতা। কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপী নিয়েও ঘটেছে অনেকের ধারণার পরিবর্তন। আমার এই চলমান সিরিজ লেখাটি যদি একটি মানুষের মনেও কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপী নিয়ে বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর করতে পারে, তবেই আমি আমার লেখার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি মনে করবো। যখন লিখতে শুরু করেছি তখন পেরিয়ে গেছে রাত দু'টা। দিল্লীর জায়পি ভাসান্ত কন্টিনেন্টাল হোটেলের ৭ম তলায় বসে লিখতে শুরু করলাম এ লেখাটি। গত চার দিনে মানুষ কর্তৃক নিপীড়িত শিশু ও নারীদের যত্ন ও মানসিক সেবার মান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি। এখানেও উঠে এসেছিল এ অঞ্চলে কাউন্সেলিং এর মডেল বিভ্রান্তির কিছু কথা। কথায় কথায় উপলব্ধি করলাম যে কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপী নিয়ে যে বিভ্রান্তি তা কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়, এই বিভ্রান্তি কম-বেশী ছড়িয়ে রয়েছে– গোটা সার্ক অঞ্চল জুড়েই। এই বিষয়ে আলোচনার গুরুত্ব সে অর্থে যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও দেখছি তা অনেক বেশী।]

কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপী দিতে গিয়ে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা কোন মডেলের ধার ধারেন না। তারা মনে যা আসে তাই বলে বসেন, যা মন চায় তাই করে বসেন। তাহলে শুরুতেই একটা গল্প বলি। সরাসরি দেখেছে ও যার কাছ থেকে শুনেছে দ্বিতীয় জন, তার কাছ থেকে পাওয়া কাউন্সেলিং এর বাংলাদেশী মডেলের গল্প এটা। গল্পটা এরূপঃ

পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহ নিয়ে এসেছে এক পরিবার, মা-বাবা ও ছেলে। মা-ছেলে এক পক্ষ আর রিটায়ার্ড বাবা একাই এক পক্ষ। কাউন্সেলর এর কাছে এসে সবাই বয়ান করলো যার যার কথা– আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কথা শুনতে শুনতে কাউন্সেলর মশায় একশন নিয়ে বসলেন পুলিশী কায়দায়। তিনি বললেন, যত দোষ ঐ বুড়ো বাপ এর, রিটায়ার্ড বাপ অফিস থেকে রিটায়ার্ড করে ঘরে বেশী বেশী নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে, ফলে তরুণ ছেলের মন বিগড়ে যাচ্ছে। এখানে ছেলে নির্দোষ, বাপই দায়ী, আর ছেলে ভক্ত মা-এর মতও যেহেতু-এমনি, রসিক কাউন্সেলর রায় দিলেন ছেলেকে উস্কে দিয়ে– "আসল চিকিৎসা হ'ল তোমার বাবার প্রয়োজন পিটুনী। তুমি ইয়াং ছেলে, তাই তুমিই পারো তোমার বাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে, তুমি যা করবে তা হল এই যে, ঘরে গিয়ে যখনি তোমার বাবা উল্টোপাল্টা কিছু করবে, তুমি তখন কষে তোমার বাবার দু'গালে দু'টো চড় মেরে দেবে। আর তাই হবে তোমার বাবার আসল চিকিৎসা।" যেই কথা সেই কাজ। ছেলে ঘরে গিয়ে বিজ্ঞ কাউন্সেলর এর আসকারা পেয়ে তাই ঘটিয়ে বসলো। কষে বসিয়ে দিল নিজ বাবার দু'গালে দু'টো চড়, যা সে আজন্মেও কখনো করেনি। এই ঘটনা তখন মুখরোচক খবর হয়ে ছড়িয়ে পড়লো বহুদূর, কিন্তু ঐ পরিবারটির হ'লটা কি? মডেল বিভ্রান্তিতে ভরপুর কাউন্সেলিং এর চাপে ঐ পরিবারে যেটুকু শান্তি বাকী ছিল বুঝি সেটুকুও শেষ হয়ে গেল।

এই বেওকুফ কাউন্সেলর কোন মডেল বুঝেন না, তিনি বুঝেন শুধু তার মনগড়া কমনসেন্স কাউন্সেলিং। আর সেই সাথে আমাদের দেশের গো-বেচারা সাহায্য প্রার্থীর দলও তথাকথিত বিজ্ঞ কাউন্সেলেরগণ যা বলেন তাই মেনে নেয় বেদ ব্যাক্যের মত করে। ফলে আর যাই হোক না কেন কাউন্সেলিং এর মডেল বিভ্রান্তি পাকাপোক্তই হয়ে থাকছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। এমনকি এরূপ বিভ্রান্ত মডেলে অখাদ্য কুখাদ্যরূপী ভ্রান্ত কাউন্সেলিং পেয়ে পেয়ে এবং তা বদ হজম হয়ে অনেকের এমনি বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে বাংলাদেশে কাউন্সেলিং-এ কোনই কাজ হয়না, কারণ তারা তা নিয়ে দেখেছে (যদিও তা অখাদ্য ছিল যা তারা এখনো জানেন না), তার চেয়ে চলো বিদেশ গিয়ে খোঁজ করিগে যদি কোন ভালো কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপীর সন্ধান খুঁজে পাই এই জীবনে তবে প্রাণে বেঁচে যাই মোরা।

বাংলাদেশে অন্য আর এক দল কাউন্সেলর আছেন তারা কালে ভদ্রে সুযোগ পেয়েছেন দু'তিন সপ্তাহের কোন এক মডেলের কাউন্সেলিং কোর্স– যেমন, আই মুভমেন্ট ডিসেনসিটাইজেসন এন্ড রিপ্রসেসিং (ই.এম.ডি.আর), রোজারিয়ান কাউন্সেলিং, বিহেভিয়ার থেরাপী, ফ্যামেলি থেরাপী, ট্রানজ্যাকশনাল এনালাইসিস, ন্যারেটিভ থেরাপী,

এক্সিসটেনশিয়াল থেরাপী, এবং কিম্বা এ সবগুলোর সমন্বয়ে এক জগাখিচুড়ী মডেল, যাকে কেউ কেউ আদর করে ডাকেন– "সাইকো-সোসাল কাউন্সেলিং", শেখার, তাও অনেক ক্ষেত্রেই ধারণা পর্যায়ে, দক্ষতা বা স্কীল পর্যায়ে নয়। আর যদি কেউ দীর্ঘ সময়ের ট্রেনিং পেয়েও থাকেন, তারা অরিজিনাল গুরুর কাছে কত ঘন্টা সুপারবিশন পেয়েছেন ? যেখানে দক্ষ কাউন্সেলের তৈরী হবার শর্ত হল অন্তত: দক্ষ সুপারভাইজার-এর তত্ত্বাবধানে ৩,০০০ ঘন্টা সুপারভাইজড্ কাউন্সেলিং প্যাক্টিসের অভিজ্ঞতা অর্জন করা! ক্লাসরুম লেকচারে কিছু সহজ তাত্ত্বিক কথার নাড়াচাড়া, এরপর ক্লাসরুমেই এক্সপেরিয়ানসিয়াল লার্নিং এর নাম করে শুধু আত্মকাহিনী শোনা বা শোনানো, বড় জোর নাটকীয় কায়দায় রোল প্লে, বা আস্ত নাটক বা নৃত্য নাট্য তৈরীর মাধ্যমে কাউন্সেলর বা সাহায্য প্রার্থীর মনের অবস্থার সাময়িক পরিবর্তন হলেও তা মনের গভীর ব্যথা, গভীর ট্রমা, চিন্তার মাঝের জটলা বা আবেগের চাপে সৃষ্ট শারীরিক প্রতিক্রিয়া কমাবার জন্য যথেষ্ট কিনা? এ ব্যাপারটা নিয়ে চলছে বাংলাদেশে অনবরত এবং একটির পর একটি মডেল বিভ্রান্তি, ট্রেনিং বিভ্রান্তি, সুপারভিশন বিভ্রান্তি, ট্রেনিং পরবর্তী কাউন্সেলিং সিস্টেম বা কর্মপদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বিভ্রান্তি, কাউন্সেলিং এর দক্ষতা যাচাই বা মূল্যায়ন বিভ্রান্তি। এ সব বিভ্রান্তির পেছনে আছে রাশি রাশি অসচেতনতা, যার যা কাজ নয় তার তা করতে চাওয়া, যার যে বিষয়ে ক্ষমতা থাকার কথা নয়, তার সে ক্ষমতা মাটি কামড়ে কাঙালের মত আটকে পড়ে থাকা, যার যাতে বুঝ নেই তার সে বিষয়ে বিজ্ঞের ভান (প্রিটেনশন) করা– মিসেস প্যাকেলস টাইট টাইগার এর ন্যায়। কিন্তু এসবই ক্ষণিকের চাকচিক্য মাত্র, প্রকৃত মুখোশ উন্মোচিত হতে বাধ্য, কালের বাস্তবতার চাপে, সত্যের মানদন্ডে। কারণ এ সকল কাঙাল অস্পষ্ট প্রিটেনশন ধারী মিসেস প্যাকলসটাইট এর ন্যায় বাঘ শিকারীর দল শেষ পর্যন্ত বড় জোর ইঁদুর শিকার করা পর্যন্ত যে ক্ষমতা রাখে মাত্র, তার প্রমান মেলে পরতে পরতে– যার ফল ভুক্তভোগী রোগীদের নানা ভোগান্তি, মরণতুল্য দশা দেখে। পাঠক মাফ করবেন, যদি আমি এক বিন্দুও বেশী বলে থাকি। আমার কথায় আপনি ভিন্নমত পোষণ করলেও আমার কোন আপত্তি থাকবে না, আপনার সাথে আরো দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে যেতে বা চা এর আড্ডায় আপনাকে আরো কিছু বাংলাদেশী কাউন্সেলিং এর মুখরোচক গল্প শোনাতে আমি এখনো প্রস্তুত। সে গল্প তো হয়ে দাঁড়াবে আরব্য উপন্যাসের হাজার রাতের গল্পের ন্যায়, যা শুনে আপনি আমার সাথে একমত হবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর যদি আপনার এতেও আপত্তি থাকে আমার কথার সাথে, তাহলে আপনাকে একটি পুস্তকের রেফারেন্স দেই, যেখানে কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর মডেল সমূহের আমলনামা ছাপা রয়েছে, যা অতি যত্নের সাথে তৈরী করেছেন বৃটেনের খোদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হুকুমে দুই জাদরেল গবেষক ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট এন্থনি রথ ও পিটার ফনেগী, যাদের রচিত পুস্তকটির পুরো নামঃ "হোয়াট ওয়ার্কস ফর হোম? এ ক্লিনিক্যাল রিভিউ অব সাইকোথেরাপী রিসার্স।"

এখন কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপী নিয়ে বা তাদের মডেল মূল্যায়ন নিয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টদের এত কথা ভাবার, এত গবেষণা আর চুল চেরা বিশ্লেষণের দরকারটা কি? যার কাজ যে করে গেলেইতো হোল মামলা ডিসমিশ্। কিন্তু না। মামলা এত সহজে ডিসমিশ্ হবার নয়– যদিনা আমরা আমাদের সেবার মানের দায়দায়িত্ব কতটুকু তা বুঝতাম বা বুঝার চেষ্টা করতাম। যদি না আমরা বুঝতাম মনোবিজ্ঞান কি– কারা প্রকৃত মনোবিজ্ঞানী, প্রকৃত কাউন্সেলর বা প্রকৃত সাইকোথেরাপীষ্ট। এদের ডিগ্রী, সার্টিফিকেট, ট্রেনিং বা অভিজ্ঞতার প্রকৃত মূল্য যদি আমরা বুঝতাম তাহলে আমাকে আর এই লেখা লিখতেই হতনা। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপী খুবই কাঁচা অবস্থায় রয়ে গেছে। এর মূল কারণ আমার দৃষ্টিতে মডেল বিভ্রান্তি। এরূপ বিভ্রান্তির যে নানাদিক আছে তা আগেও বলেছি, আজও বলছি। ধরুণ কাউন্সেলিং-এর ট্রেনিং-এর সময়কাল কত হওয়া বাঞ্ছনীয়? এ সংক্রান্ত সঠিক চিন্তাটা কি? এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত তেমন ভাবে গাহ্য না করেই যা হতে দেখা যায় তা হল ডোনার এবং এনজিও কর্মকর্তারা মিলে ঠিক করে ফেলেন যে কাউন্সেলিং-এর একখানা ট্রেনিং হবে ৩ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যেই। যেখানে ট্রেনিং প্রয়োজন অন্তত: ৬ মাস থেকে ২ বছরের, সেখানে ৩-৬ থেকে সপ্তাহের ট্রেনিং কি তীব্র মানসিক যাতনার আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিরাময়ের জন্য যথেষ্ট? তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক মিলিয়ে যাও বা হল কোন স্বল্প মেয়াদী ট্রেনিং, পরবর্তীকালে যে মডেলে ট্রেনিং হল, সেই মডেলে দক্ষ সুপারভাইজার কর্তৃক সুপারভাইজড কাউন্সেলিং প্যাক্টিস এর সুযোগ সৃষ্টির অভাবে বাংলাদেশের অনেক স্বল্প মেয়াদী কাউন্সেলিং-ট্রেনিংও মাঠে মারা পড়ছে। একবার ট্রেনিং হলতো দেখা গেল, ট্রেনিং-এর মূল্যায়ন তেমন ভাবে নেই, যা থাকে শুধু নামকাওয়াস্তে। সে ট্রেনিং কতজন যোগ্য কাউন্সেলর তৈরী করতে সক্ষম হল, বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত কাউন্সেলরদের কাউন্সেলিং প্রয়োগ দ্বারা কত রোগী নিরাময় পেল, এরূপ দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব বা ইম্প্যাক্ট স্টাডি করার দিকেও তেমন গরজ দেখা যায় না। এরূপ মনোভাবের পেছনের সঠিক চিত্রটা তাই আমাদের অনুধাবন করাটা আগে প্রয়োজন। অন্যথায় ট্রেনিং হবে ঠিকই, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তা হয়ে দাঁড়াবে শুভঙ্করের ফাঁকি– প্রকৃত ফলাফল হবে শূন্য মাত্র। আরেক বড় বিভ্রান্তির দিক হল কাউন্সেলিং-এর ট্রেনি নির্বাচন। ট্রেনি যদি ঠিক হয় তদ্বীর দ্বারা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা, আবেগের পরিপক্কতা, ব্যক্তিত্ব ও তার নূতন কাজ শেখার মত আগ্রহ ও সৃজনশীলতা বিচার না করেই, কারণ এটা হয়তো মনে করা হয় যে কাউন্সেলিং অতি সহজ কাজ, যে কেউ সামান্য দেখিয়ে দিলেই তা করতে পারে অনায়াসে, এরূপ ভাবনাটাই ভুল, বিভ্রান্তিকর। আরো বিভ্রান্তি হয় ট্রেনি নির্বাচক মন্ডলী নিয়ে। ক্ষমতাধর কিছু ব্যক্তি যদি নিজেদের কমনসেন্স ও তদ্বীরের কথা মনে রেখে নির্বাচন করেন কাউন্সেলিং ট্রেনি, এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ, কোচ বা সুপারভাইজারদের রাখেন নির্বাচক মন্ডলীর বাইরে, তবে তাও তো বিভ্রান্তিকর। বাংলাদেশ তো এখনো সেই রাম রাজত্বের দেশ যেখানে যে যা খুশী তাই করতে পারে, যে যা খুশী তাই বলতে পারে, তাই মুখে লাগাম নেই অনেকের, আর কর্মফলের বিচার নেই, শুধু এক হাশরের ময়দান ছাড়া, এখানে তাই নেই কোন একাউন্টেবেলিটি, নেই কোন কোয়ালিটি কন্ট্রোল বা

প্রফেশনালিজম। তাই এখানে মুড়ি মুড়কীর একদর। প্রফেশনাল সাইকোলজিষ্ট, প্যারা সাইকোলজিষ্ট, সিওডো সাইকোলজিষ্ট সর্ট কোর্সে সার্টিফিকেটধারী মিনি সাইকোলজিষ্ট সকলকেই মুড়ি ও মুড়কীর ন্যায় এক দরেই বিক্রী হতে হয় সিস্টেমগত ফন্দিফিকির এবং কিছু কিছু জ্ঞানপাপীর নির্লজ্জ বেহায়াপনার জন্যে। এ জন্যইতো খোদ শিল্পী কামরুল হাসান তার মৃত্যুর পূর্বে এঁকে গিয়েছেন তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম– "বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে বাংলাদেশ।" এই বেহায়াদের দেশে সব কিছুই সম্ভব; সম্ভব দিনকে রাত করা, রাতকে দিন করা; শুধু সম্ভব নয় যাদের জন্য চাকুরী করি, যাদের সেবার নাম করে পয়সা নেই, তাদের প্রতি, তাদের মঙ্গলের প্রতি একাউন্টেবল হওয়া। আমরা এমনি এক স্বাধীন দেশ বানালাম যেখানে সেবার নামে চলে স্বেচ্ছাচারিতা; মানুষের দারিদ্রতাকে পুঁজি করে চলে নানা প্রকার ব্যবসা, মানুষের মনোকষ্ট মনো যাতনা নিয়েও চলেছে নানা প্রকার গলাবাজি আর অন্ত:স্বার শূন্য কর্মকান্ড। এ সবই ধোপে টিকবেনা যদি আমরা চালু করতে পারি কেবল সিস্টেম অব একাউন্টেবিলিটি, যা সম্ভব ইভিডেন্স বেজ্ড প্রাক্টিস এর দ্বারা কোয়ালিটি কন্ট্রোল এর মাধ্যমে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে কোনটার কোন্ দর, কোন্টা আসল আর কোনটা নকল। ঘুনে ধরা এই বাংলাদেশ আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে বোধ করি তার আর নীচে নামার জায়গা নেই, এবার উঠার পালা– স্বেচ্ছাচারিতা আর বেহায়াপনা দিয়ে আর কত দিনই বা চলা যায় বা চলতে দেওয়া যায়। ঘুনে ধরা অচলায়তন ও ব্যবস্থাপনা গুলোতো আপন দোষে (কিম্বা নিজ গুনে) নিজেই নিজে থেকে ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। এই ভাঙ্গা ঘর গড়তেই আমি ডাক দিয়ে যাই তরুণ প্রজন্মের প্রকৃত মনোবিজ্ঞানী, প্রকৃত কাউন্সেলর, প্রকৃত সাইকোথেরাপীষ্ট, প্রকৃত সমাজকর্মী ও প্রকৃত সেবাপরায়ণ চিকিৎসকদের–যারা তাদের বুদ্ধি, অনুভূতি ও কান্ডজ্ঞানের দ্বারা এদেশের মানুষের মনোজগতে ঘটাবে আশু পরিবর্তন, এর সাথে যুক্ত সকল বিভ্রান্তির অবসান হবে, যার ফলস্বরূপ ঘটবে স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন।

সবশেষে, কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপী নিয়ে চলমান মডেল বিভ্রান্তি ও সেই সাথে মানসিক স্বাস্থ্য ও গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গলদ ও বিভ্রান্তি দূর করতে চাই আমাদের সকলের বুদ্ধি দীপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ উদ্যোগ এবং চলমান আন্দোলন। আমরা কি পারিনা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে, একখানা একুশ শতকের উপযোগী মানসিক স্বাস্থ্য ও সমাজ গঠন আন্দোলনের জন্ম দিতে– যা সুনামীর ন্যায় দূর করে দেবে আমাদরে সকল দৈন্যতা, নীচতা, হীনতা, অজ্ঞতা, বেহায়াপনা ও প্রিটেনশনপনা? সত্য সুন্দর ন্যায় ও কল্যাণের দ্বারা অবগাহিত হবে বাংলাদেশ কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর পরতে পরতে তখন বইবে বসন্তের সুবাতাস, যার ফলে দেখা দিবে ভুক্ত ভোগী মানসিক যাতনাগ্রস্থ মানুষের মুখে অনাবিল হাসি। সেই সুদিনের অপেক্ষায় রেখে যেতে চাই আমাদের পদচিহ্ন– কিন্তু প্রশ্ন হ'ল তা কিভাবে, এবং তা আর কত দূরে? (চলবে)

লেখক পরিচিতি

ডঃ মাহমুদুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ হতে বি,এস,সি(সম্মান) ও এম,এস,সি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কানাডা-এর ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম, এ ও পি.এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে পোস্ট ডক্টরাল ট্রেনিং (ইউ,কে) করেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি 'মনোবিকাশ' নামক ক্লিনিক-এর পরিচালক।

সম্পাদকের নোট

এ লেখায় লেখক স্বতস্ফূর্ত ভাবে তার মনের কথা তুলে ধরেছেন। 'দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী লেখকের লেখাটি হুবহু প্রকাশ করলেন। তার মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়।

Yet only a small minority of the 450 million people suffering from a mental or behavioural disorder are receiving treatment.

[The World Health Report 2001]